তেহরান-ওয়াশিংটনে অগ্নুৎপাত: নেপথ্যে ইসরায়েল:
নতুন বিশ্বব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত

সিআইএ সমর্থিত ১৯৫৩ সালের অভ্যুত্থান এবং ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সংঘাতপূর্ণ, তিক্ততা এবং অবিশ্বাসের রুপ পরিগ্রহ করে। আর ওদিকে ফিলিস্তিনের বুকের ভিতর ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের ইরানে যখন আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে একটি সফল ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হয়। তখন থেকেই নব্য প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল ইরানকে তাদের অস্তিত্বের জন্য প্রধান হুমকি মনে করে আসছে। পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনায় এটি নিশ্চিত ভাবে বলা চলে যে, ইরানকে সার্বিকভাবে অকার্যকর করার নেপথ্যের অন্যতম মাস্টারমাইন্ড হলো ইসরায়েল। দেশটির একটি চরমপন্থী জায়নবাদী রাজনৈতিক ধারণা হল গ্রেটার ইজরায়েল। যা মূলত বাইবেলের উদ্ধৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে নীলনদ থেকে ফুরাত নদী পর্যন্ত প্রাচীন ইজরাইয়েলি ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন। এর অন্যতম লক্ষ্য সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্ডান এবং ইরাক ও মিশরের অংশ বিশেষ নিয়ে একটি বিশাল ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন এবং কট্টর ডানপন্থী মন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচসহ অনেকে এই ধারণাকে ‘ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি’ হিসেবে তুলে ধরেন। মার্কিন সরকারের সাথে সর্বোচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকায় তারা সার্বক্ষণিক মার্কিন ছত্রছায়ায় থেকে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলটিকে অস্থিতিশীলতায় নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। অতি- সাম্প্রতিক সময়ে ইরান মার্কিন যে উত্তেজনা তার নেপথ্যেও রয়েছে ইসরায়েলের জায়নবাদী মননের এক সরব ষড়যন্ত্র।

গত প্রায় পাঁচ-ছয় দশকের ইতিহাসে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে ইসরায়েলের অগণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় একমাত্র ব্যারিয়ার তৈরি করেছে ইরান। রাষ্ট্রটি এখন পর্যন্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে স্ব-গৌরবে টিকে রয়েছে।

একজন রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী থেকে দুই দুইবার প্রেসিডেন্ট বনে যাওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প মূলত এই যুদ্ধে জড়িয়েছেন তার মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র চায় ইরানের প্রভাব কমানো এবং ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা ধ্বংস করা। একটি ব্যর্থ পারমাণবিক আলোচনার পর এপ্রিলের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায়। ট্রাম্পের ইরান যুদ্ধে জড়ানোর মূল কারণগুলো হতে পারে-ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি রোধ,ইরানের মিত্রদের দুর্বল করা, ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও ব্যর্থ কূটনৈতিক আলোচনা। যদিও এই যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভিন্ন মত রয়েছে। সেখানে অভিযোগ উঠেছে যে,

এই যুদ্ধে ট্রাম্প স্বেচ্ছায় নিজ স্বার্থে জড়িয়েছেন কোন বাহ্যিক প্ররোচনায় নয়। কারণ, বাইডেন প্রশাসনের সময় ইরান যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ভিন্ন অবস্থানে ছিল।

ইরান আগে থেকেই ইসরায়েলের অবস্থান এবং তাদের সহযোগী আমেরিকার ব্যাপারে অবগত থাকায় তারাও কৌশলগতভাবে এর মোকাবিলা করতে পারছে। সুদীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমা দেশগুলো ধরেই নিয়েছিলো–

বিমানবাহী রণতরি, নৌবহরের বিশালতা আর উন্নত প্রযুক্তি থাকলেই সব করা সম্ভব। কিন্তু, সাম্প্রতিক বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা।

ইরান তাদের উপর অনেকটা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ মোকাবিলায় কিছু কৌশলগত অবস্থানের জানান দিচ্ছে। এবং এর ফলশ্রুতিতে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তির যেমন টনক নড়ছে সেইসাথে পুরো বিশ্ব ব্যবস্থায় ও পড়ছে এর প্রভাব।

এক হরমুজ প্রণালি বা বিকল্প নিউক্লিয়ার ওয়েপন দিয়েই ইরান কাঁপিয়ে দিচ্ছে অপোনেন্ট দেশসমূহকে। এটি সম্ভব হচ্ছে তাদের বিকেন্দ্রীভূত প্রতিরক্ষা কাঠামোর সৌজন্যে।

রহস্যময় ভৌগোলিক কাঠামোও ইরানের অন্যতম শক্তি। তাছাড়া কেন্দ্রের নির্দেশনা ছাড়াই স্থানীয় ইউনিটের রয়েছে কাজের ক্ষমতা। ফলশ্রুক্তিতে কেন্দ্র কোন কারনে আক্রান্ত হলেও যুদ্ধ বন্ধের আশঙ্কা থাকে না।

বিভিন্ন কৌশলগত দিক বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রও এখন অনেকটা দ্বিধাগ্রস্থ। তাই তারা সামরিক উপস্থিতি যেমন বজায় রাখছে ঠিক তেমনি কূটনৈতিক তৎপরতাও অব্যাহত রেখেছে।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় সাময়িক যুদ্ধ বিরতিও চলমান আছে। যদিও দুই পক্ষই মাঝেমধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় জারি রেখেছে। এই যুদ্ধের অনেক কিছুকেই চাপিয়ে এখন আলোচনায় হরমুজ নামের প্রণালিটি যার সবচেয়ে সরু অংশও মাত্র ২১ মাইল চওড়া।

ইরানের হাতে থাকা এই আপেক্ষিক ক্ষেপণাস্ত্রটিই এখন গেম চেঞ্জার হিসেবে সবচেয়ে আলোচনায়। ইরান যখন থেকে হরমুজের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাদের মতো করে পরিচালনা করছে তখন থেকেই প্রায় পুরো বিশ্বব্যাপী এর প্রভাব তৈরি হচ্ছে।

এই সংকটে চীন-ভারতও হরমুজের প্রভাবলয়ের বাইরে না। কারণ ভারত ও চীন এই প্রণালির তেলের উপর নির্ভরশীল। তাই তারা পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেজন্য কৌশলগত ভূমিকা পালন করছে।

একাধিক ইস্যু যদিও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় অন্যতম হয়ে ওঠেছে হরমুজ প্রণালি। যা সন্দেহাতীত বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট। ইরান এটি খুব সতর্কতার সাথেই নিয়ন্ত্রণে রেখে সম-অবস্থানের জানান দিয়ে চলেছে এই যুদ্ধে।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই যুদ্ধ পরিচালনার অনেকগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– ইরানে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, গণঅভ্যুত্থানকে উসকে দেয়া, কুর্দিদের ইরানের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থানে আনা এবং ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া।

এখন পর্যন্ত যুদ্ধ পরিস্থিতির অবস্থা বলে, তাদের এই উদ্দেশ্যসমূহের প্রায় প্রতিটিই ব্যর্থ হয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ইতোমধ্যে বলেছেন ইরানের পারমাণবিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার ট্রাম্প কে? আর ইরানের নতুন ও তৃতীয় সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি বলেছেন তারা বারবার আলোচনার নাম করে যদি এভাবে ধোঁকা দিতেই থাকে তাহলে আমেরিকা ও ইসরায়েলকে ভয়ানক পরাজয় বরণ করতে হবে। ইরান প্রস্তুত রয়েছে। এদিকে নিউইয়র্ক টাইমস একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে তারাই বলছে এশিয়ায় আমেরিকার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ছে।

স্কাই নিউজের সামরিক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাইকেল ক্লার্ক বলেছেন– ট্রাম্প এখন যে পথই বেছে নিক না কেন, আমি শুধু আমেরিকার পরাজয়ই দেখতে পাচ্ছি।

নিউইয়র্ক টাইমসের অন্য একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, নেতানিয়াহু একাই এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এতে টেনে এনেছিলেন। বেনিয়ামিন হয়তো চেয়েছিলেন ইরানকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করে নিজেদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে দেখতে। প্রকৃত অর্থে হয়েছে ঠিক এর উল্টোটা। এতে, আন্তর্জাতিক

অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ভাবমূর্তি হয়েছে ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন। হরমুজের একক নিয়ন্ত্রনাধিকার নিজেদের কাছে রেখে ইরান বরং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ তৈরি করতে শুধু সক্ষম নয়, সফলও হয়েছে এর মধ্যে।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি বেআইনি যুদ্ধ শুরু করে, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের বৈধ নেতাকে হত্যা করে, একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি প্রদানের ফলে যুক্তরাষ্ট্র মানুষের হৃদয় জয়ের লড়াইয়েও হেরে গেছে।

যদিও বিভিন্ন সময় বেনিয়ামিন ইরানকে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও পশ্চিমা আধিপত্যের প্রধান শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করে আসছিলেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, যুদ্ধের ফল হিসেবে এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে ইরান। সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথের নিয়ন্ত্রণ এখন তাদের হাতে। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের

সবচেয়ে শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে রাষ্ট্রটি। অপর দিকে ইসরায়েলের একক আধিপত্য তৈরির স্বপ্নে যেনো বড় ধরনের একটি ধাক্কা এবং জবাব এটি।

ইরানের এই উত্থানের ফলে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরতার বিষয়টি এখন প্রশ্নের সম্মুখীন।

যদি এই রাষ্ট্রগুলো আস্তে আস্তে মার্কিন নির্ভরতা থেকে বেড়িয়ে আসা শুরু করে তাহলে এই অঞ্চলে তাদের একাধিপত্যের যে যবনিকাপতন হচ্ছে সেটি অনেকটাই নিশ্চিত।

নিজেদের আগের অবস্থানে ফিরে পাবার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র হয়তো ইরানের সাথে দীর্ঘমেয়াদি কোনো চুক্তিতে যেতে পারে। যদি চুক্তি না হয় তাহলে আবারও সামরিক হামলার কথা জানান ট্রাম্প।

ইরান যদিও ইতোমধ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এবং তাদের জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বদানকারীদের হারিয়েছে। কিন্তু তাদের টিকে থাকাটাতে বিস্ময় প্রকাশ করছে অনেকেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যদি ইরানের চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেটা শুধু নেতানিয়াহুর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরাজয় হবে না; তা হবে এত দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরও চপেটাঘাত।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, তৈরিকৃত সংকট সামলাতে বাধ্য হওয়ার কারণেই ট্রাম্পের থেকে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা এসেছে।

এ যুদ্ধ থেকে এটা এখন পর্যন্ত প্রতীয়মান যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান অবশ্যম্ভাবী।

ইরান যুদ্ধের সামরিক ফলাফল যদিও এখনো অভবিতব্য তবে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সমর্থন ও জনমতের বিষয়টিতে ইসরাইল আর পূর্বের অবস্থানে থাকছে না।

বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যত যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল কূটনৈতিক সম্পর্কেও ধরতে পারে ফাটল।

ইসরাইলের নেপথ্য রাজনীতি, আমেরিকার মদদ এবং ইরানের প্রতিরোধপূর্ণ প্রাচীরের ন্যায় নিজেদের জানান দেয়াটা সামনের দিনে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার স্পষ্ট ইঙ্গিত।